অতিথি সম্পাদকের কথা

বিআইবিসি / আইরিন খান

পড়শী'র বর্তমান সংখ্যার মূল রচনাবলীর গঠন ও ধারা পূর্ববর্তী অন্যান্য যে কোন সংখ্যার তুলনায় ভিন্নতর। দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী বিষয় নিয়ে এর পসার - একাংশ হলো ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা ক্লারায় অবস্থিত বাংলাদেশ আইটি বিজনেজ সেন্টার (বিআইবিসি)-কে নিয়ে আর অন্য অংশ হলো মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল আইরিন খানকে নিয়ে।

বিআইবিসির উদ্দেশ্য, বয়স, গঠন প্রকৃতি, বাজেট এবং বাংলাদেশ সরকারের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ইত্যাদি বিবেচনায় নিলে বিআইবিসিকে নিয়ে চুলচেরা বিশে-ষণের সময় এখনো হয়নি। তবে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, ২০০০ সালে আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারস এন্ড আর্কিটেক্টস (এএবিইএ)-এর উদ্যোগে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী-নির্ভর প্রচেষ্টায় ১২০,০০০ মার্কিন ডলার খরচ করে SBIT2000 (সিলিকন বাংলা ইনফরমেশন টেকনোলজী ২০০০) সম্মেলনের কারনে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছিল বিআইবিসি এক বছরে ৪৯৯,০০০ মার্কিন ডলার খরচ করে তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। এটা সংশি-ষ্ট মহলের আশা যে দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি বিআইবিসি তাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফসল ঘরে তুলতে পারবে এবং বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি রপ্তানির প্রসার যুক্তরাষ্ট্রে করতে পারবে।

বিআইবিসি সম্পর্কে দুটো কথা না বললেই নয়। তার একটি হলো এর গঠন কাঠামো এবং অন্যটি হলো বেতনভুক্ত ও অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবীদের কষ্টকর সংমিশ্রণ। বিআইবিসি'র রিপোর্টিং কাঠামোতে যেমন রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তেমনি রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ অভিভাবক সংগঠন এএবিইএ। আরো রয়েছে অবৈতনিক ম্যানেজমেন্ট কমিটি। এ ধরনের অবকাঠামো নিয়ে তিন সদস্যের একটা বৈতনিক প্রতিষ্ঠানের কতদূর বাণিজ্যিক সফলতা অর্জন সম্ভব সেটা আরো গভীরে তলিয়ে দেখার সময় হয়েছে। সর্বোপরি, বেতনভুক্ত কর্মচারী আর অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে কোন বাণিজ্যিক ফর্মুলা সফল হওয়ার উদাহরণ দেয়াও প্রায় অসম্ভব। তাতে জবাবদিহিতা ও ব্যবস্থাপনার সংকট হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিআইবিসি'র ব্যর্থতা কিংবা সফলতার উপর এ ধরনের আরো উদ্যোগের ভাগ্য নির্ভর করছে। পড়শী বিআইবিসির সাফল্য কামনা করে।

আইরিন খান বিশ্ব বাঙালির গৌরব। তিনি প্রথম বাঙালি যিনি এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেলের মত গুরুত্বপূর্ণ পদের শোভাবর্ধন করছেন। আরো বিশেষভাবে উলে-খ্য যে, এ পদে তিনিই প্রথম বাংলাদেশী এবং প্রথম মহিলা। আইরিন খানের পরিচিতি এবং বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যৎসামান্য আলোচনা এ সংখ্যা পড়শীতে রয়েছে। পড়শীর বিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আইরিন খানকে পাওয়া যায়নি একটি সাক্ষাৎকারের জন্য। পড়শী'র পাঠকদের জন্য এটা ভবিষ্যতের পাওনা রইল। তবে এই সুবাদে বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতির একটা চেহারা ফুটে উঠছে। ❑

সাবির মজুমদার
সিলিকন ভ্যালী, ক্যালিফোর্নিয়া

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ধারাবাহিকতায় বিআইবিসি

হাবিবুল-াহ নেয়ামুল করিম

১৯৯৭ সালের শীতের এক বিকালে লীডস কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শেখ আবদুল আজিজ আমাকে ফোনে জানালেন যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তথা সরকার দেশের সফটওয়্যার শিল্পের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর এবং এখাতে রপ্তানি থেকে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপারে খুবই আশাবাদী। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন এ ব্যাপারে সফটওয়্যার শিল্পের সাথে জড়িত সবাইকে একত্রিত করতে। জনাব আজিজ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটি)-এর একজন ভূতপূর্ব ক্যারিয়ার এক্সিকিউটিভ, জনাব আজিজ বিএটি ছাড়ার পর তৈরি পোশাক শিল্পে কিছুদিন পদচারণা করেন এবং '৮০ দশকের শেষাংশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আগমন করেন এনসিআর-এর বাংলাদেশ পরিবেশক হিসেবে। '৯৭ সালের সেই বিকেলে দেশের বেশ ক'জন তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমাকে ঐ অনুরোধের কারণ হল, এর বছর চারেক আগে ('৯৩ সালের মাঝামাঝি) আমি ও আইবিসিএস প্রাইম্যাক্স-এর

প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জনাব আবু আহমেদ বাংলাদেশের সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি ইন্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশনে দলবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিলাম যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা শিল্পের উন্নয়নের পথে যে সকল অবকাঠামোগত, আইনী, প্রশাসনিক ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত বাধাসমূহ বিরাজমান ছিল সেগুলিকে সমষ্টিগতভাবে সংস্কারের ও উত্তরনের ব্যবস্থা করা। আইবিসিএস প্রাইম্যাক্স-এ মরহুম আবু আহমদের উত্তরসুরী হচ্ছেন এর বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব এ তৌহিদ। আমি জনাব তৌহিদ-এর সাথে যোগাযোগ করলাম এবং ওনার ধানমন্ডির অফিসে ছোট-বড় সব আইটি কোম্পানি যাদের সফটওয়্যার ও আইটি সার্ভিস-এ আগ্রহ আছে তাদের সবাইকে সমবেত হতে আহ্বান জানাই। এরই ফলশ্রুতিতে একত্রিত হয়ে গঠন করি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস - সংক্ষেপে বেসিস। বেসিস-এর পতাকাতলে দেশের সকল সফটওয়্যার নির্মাতা ও আইটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এই খাতের উন্নয়নে সর্বসম্মতিক্রমে পাঁচ দফা কর্মসূচী হাতে নেয় - যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

(১) কপিরাইট আইন-এর সংস্কার যাতে সফটওয়্যার সত্ত্বাধিকার স্বীকৃতি পায়,

(২) দেশে সফটওয়্যার বাজার সৃষ্টি,

(৩) সফটওয়্যার ও সেবা রপ্তানী বাজারসমূহে প্রবেশ,

(৪) দেশের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন, এবং

(৫) দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কম্পিউটার সায়েন্স ল' স্নাতক প্রোগ্রাম চালুকরণ ও সিট বর্ধিতকরণ।

এই পাঁচ দফা কর্মসূচীর ফলে দেশের সফটওয়্যার শিল্পে একটি জাগরণের সৃষ্টি হয়। দেশের ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, শিক্ষাজীবী ও সরকারি মহলে প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শুভাকাঙ্খী লক্ষ্য করা যায়। যার ফলশ্রুতিতে -

(১) ২০০০ সালের জুলাই মাসে কপিরাইট আইন ২০০০ প্রণীত হয় যার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মিডিয়ামে সকল মেধাস্বত্ব স্বীকৃত যেমন সফটওয়্যার, অডিও/ভিডিও সিডি, ই-বুক ইত্যাদি।

(২) ১৯৯৯ সালে সরকার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে সিট বর্ধিতকরণ প্রকল্প হাতে নেয়।

(৩) ১৯৯৮ সাল হতে নিয়মিতভাবে বেসিস ও এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশী সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমডেক্স ফল ও পশ্চিম ইউরোপের সিবিট আইটি মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে এবং চলি-শের অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে নিয়মিতভাবে পৃথিবীর চার মহাদেশের চব্বিশটি দেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করছে।

(৪) বেসিসের সদস্য সংখ্যা ১৭ থেকে ১২৪-এ উন্নীত হয়েছে যার সিংহভাগ শুধুমাত্র সফটওয়্যার ও আইটি সেবা ব্যবসা করে।

(৫) দেশের ল্যান্ডলাইন টেলিফোন (মনোপোলি তুলে দিয়ে) বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য এ বছর উন্মুক্ত করা হয়েছে।

এ সকল কিছু সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আইটি শিল্পের সাথে জড়িত সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণার ফলে। কিন্তু এত কিছুর পরও আইটি শিল্পের সাফল্য অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে সফটওয়্যার ও সেবার পরিমাণ হতাশাব্যঞ্জক ও স্থবির। রপ্তানী বাজারে যদিও আমাদের অংশ বর্ধিষ্ণু কিন্তু তা এখনও চোখে পড়ার মত নয়। এমতাবস্থায় ২০০২ সালের দিকে বেসিস আবারও দাবি জানায় (১) দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অন্তত বছরে ৩০০ কোটি টাকা ই-গভর্নমেন্ট খাতে ব্যয় করে, (২) যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে দেশের সফটওয়্যার নির্মাতাদের জন্য শেয়ারড মার্কেটিং অফিস স্থাপন করে এবং (৩) নতুন/তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য সফটওয়্যার সেন্টার স্থাপন করে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে চার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পর্যায়ের সদস্য সমৃদ্ধ আইটি টাস্কফোর্সে বেসিস-এর পক্ষ থেকে এ প্রস্তাবনাসমূহ পেশের সুযোগ আমার হয়েছিল। সুখের বিষয় যে সরকার এ প্রস্তাবগুলো সবহ মেনে নেয়। এরই প্রেক্ষাপটে বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়।

(১) ই-গভর্নমেন্ট প্রকল্পের জন্য ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং প-্যানিং মন্ত্রণালয়ে এস.আই.সি.টি. প্রকল্প হাতে নেয়া হয়,

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোক্তা তহবিলকে ১০০ কোটি টাকা থেকে ৩০০ কোটিতে উন্নীত করা হয়,

(৩) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশ্বব্যাংকের সরকারি ও শিল্পোদ্যোক্তাদের অর্থায়নে আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (আইবিপিসি) গঠিত হয়। সান্টাক্লারা, ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ আইসিটি বিজনেস সেন্টার বা সংক্ষেপে বিআইবিসি হচ্ছে আইবিপিসি-এর একটি প্রকল্প।

(৪) বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ও বেসিসের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের প্রথম আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করা হয়। ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র কাওরান বাজারে অবস্থিত বিএসআরএস ভবনের আটটি ফ্লোর জুড়ে প্রায় সত্তর হাজার বর্গফুট এলাকার এই ইনকিউবেটরে বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশটি আইটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

এবার আশা যাক বিআইবিসি সংক্রান্ত ঘটনাপঞ্জিতে। আইবিপিসি প্রতিষ্ঠা হয় মূলত প্রাক্তন বাণিজ্য সচিব জনাব সোহেল আহমেদের ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার আঙ্গিকে। প্রকৃতপক্ষে আইবিপিসি হচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন তিনটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের একটি - বাকি দুটি হচ্ছে চামড়া শিল্প ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প নিয়ে। এই বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলগুলো মূলত রপ্তানী বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে যে শিল্পগুলি সম্ভাবনাময় সেইসব শিল্প সরকার এবং ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহের এক সেতুবন্ধন যার মাধ্যমে এই সকল শিল্পের রপ্তানী উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ দ্রুত লাঘব করা যায়। এই বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলগুলোর প্রশাসনিক কাঠামোতে বাণিজ্য সচিব পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান, এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান, শিল্পের সাথে জড়িত বাণিজ্য সংগঠনগুলোর সভাপতিদের মধ্য থেকে একজন দ্বিতীয় ভাইস চেয়ারম্যান এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি এবং বাণিজ্য সংগঠনগুলো ও বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধির সমন্বয়ে নির্বাহী কাউন্সিল গঠিত হয়। তবে শিল্পের সাথে জড়িত যে কোন প্রতিষ্ঠান এর সদস্য হতে পারে। আইবিপিসি'র প্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আইবিপিসি'র প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তীতে বিআইবিসি'র প্রতিষ্ঠার সাথে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। বিআইবিসি স্থাপনের পিছনে বাংলাদেশী শিল্পোদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য ছিল সিলিকন ভ্যালীতে এবং তার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী সফটওয়্যার ও আইটি সার্ভিসের একটি স্থায়ী বিপণন কেন্দ্র ও যোগসূত্র নিশ্চিত করা। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলে এবং এই তহবিল ব্যবহারের সময়সীমা অত্যন্ত কম হওয়ার ফলে আইবিপিসি থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে

বিআইবিসি'র ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। এইরকম একটি অলাভজনক পেশাদারী সংগঠন আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারস এন্ড আর্কিটেক্টস (এএবিইএ) যখন এ কাজে আগ্রহ প্রকাশ করে আমি ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে তা সুপারিশ করি এবং কাউন্সিল সেটা সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০৩ সালের মে মাসে এএবিইএ'র সহযোগিতায় সানটাক্লারায় বিআইবিসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিআইবিসি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল এবং তা সিলিকন ভ্যালীর বাংলাদেশী কমিউনিটিতে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। বিআইবিসি প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রায় গোটা তিরিশেক আইটি প্রতিষ্ঠান এতে সদস্যপদ গ্রহণ করে। বাংলাদেশী আইটি শিল্পোদ্যোক্তাদের বিআইবিসি নিয়ে আশা-আকাঙ্খার কমতি ছিল না। এদের অনেকেরই ধারণা ছিল যে বিআইবিসি'র মাধ্যমে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সফটওয়্যার ও আইটি সার্ভিস মার্কেটে সহজেই স্থান করে নিতে পারবে। কিন্তু গত এক বছরেরও বেশি সময়ে সে আশা খুব বেশি দূর এগুতে পারেনি। এর কারণ বিবিধ, তবে মূল যে কয়টি কারণ উলে-খ করা যায় সেগুলো হচ্ছে -

(১) বিআইবিসি'র ব্যবস্থাপনায় মার্কেটিং এক্সপার্টিজের অভাব।

(২) দেশীয় আইটি প্রতিষ্ঠানসমূহের মার্কিন সফটওয়্যার বাজার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকা।

(৩) বিআইবিসি'র আর্থিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রসূত দীর্ঘসূত্রিতা।

তবে এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিআইবিসি'র কারণে কিছু রপ্তানীর কাজ বাংলাদেশে এসেছে এবং বাংলাদেশের অনেক আইটি প্রতিষ্ঠান বিআইবিসিকে তাদের একটি মার্কেটিং আউটলেট হিসেবে ব্যবহার করতে পারছে। আনন্দের বিষয় যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন যে প্রকল্পের মাধ্যমে হচ্ছিল সেই প্রকল্পটি এ বছর জুন মাসে শেষ হয়ে গেলেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সরকারি অর্থায়নে বিআইবিসিকে ২০০৫ সালের জুন পর্যন্ত চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার বিশ্বাস বিআইবিসি'র দ্বিতীয় বছরে এটি বাংলাদেশের সফটওয়্যার রপ্তানির ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, সার্বিকভাবে বাংলাদেশের সফটওয়্যার এবং আইটি সেবা শিল্প ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সম্মুখপথে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রোডাক্ট আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সাথে চলছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আমরা ভীষণভাবে পিছিয়ে আছি তা হল, স্থানীয় বাজার সৃষ্টি এবং বহির্বিশ্বে আমাদের যা কিছু সাফল্য তা পরিপাটি করে বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করা। এই দু'টি বিষয়ে অগ্রগতি হলে তা বিশ্ববাজারে আমাদের স্থান দ্রুতলয়ে সুদৃঢ় করবে এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। ❑

ঢাকা থেকে।

জুলাই ২৭, ২০০৪

হাবিবুল-াহ নেয়ামুল করিম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তড়িৎ প্রকৌশলে গ্রাজুয়েশনের পর দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯৮৬ সালে টেকনোহেভেন প্রতিষ্ঠা করেন। জনাব করিম বেসিসের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব এবং তৃতীয় সভাপতি।

বিআইবিসি প্রতিষ্ঠার ১ বছর পর : কিভাবে এগুচ্ছে? এনআরবিরা কি ভাবছেন?

এমদাদ খান

বিআইবিসি (BIBC) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গেল। একটি নতুন সংগঠন গড়ে তুলতে যে সব বিশেষ কাজকর্মের প্রয়োজন তা বিআইবিসি কর্মকর্তাগণ বহুল পরিশ্রমের মাধ্যমে সাফল্যের সাথে শেষ করেছেন। বিআইবিসি কর্মকর্তাদের এ জন্য জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। এটা সত্যিই প্রশংসনীয়।

যে উদ্দেশ্যে বিআইবিসি সৃষ্টি করা হয়েছে তা কতটা সফল হয়েছে তা সম্ভবত এখনও পর্যবেক্ষণ করার সময় হয়নি কারণ এক বছর এ ধরনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় নয়। তবে বিআইবিসির কাজকর্ম যেভাবে এগুচ্ছে তা বিআইবিসির উদ্দেশ্য সফলে কতটা সহায়তা করবে সেটা যাচাই করার জন্য এখন একটি উপযুক্ত সময়। শুধু তাই নয়, আমাদের সাধ্য অনুযায়ী যে কোন ধরনের সহায়তা করা একান্তই প্রয়োজনীয়।

বিআইবিসির কাজকর্ম কিভাবে এগুচ্ছে তা আলোচনা করার আগে দেখা যাক বিআইবিসির উদ্দেশ্য সফলে (তথা বাংলাদেশে ইউএস থেকে আইসিটি ক্ষেত্রে কাজ নেয়া) প্রধান বাধাগুলো কোথায় :

১। যে পরিকল্পনা নিয়ে বিআইবিসি শুরু করা হয়েছিল তার সাথে প্রকৃত অবস্থার অনেক বৈষম্য রয়ে গেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আশা করা হয়েছিল যে বাংলাদেশী কোম্পানীগুলো এখানে এসে বিআইবিসির অফিস ব্যবহার করবে তাদের ব্যবসা বা কাজ জোগাড় করার জন্য। বিআইবিসি কাজ করবে এদের ফ্যাসিলিটেটিং অফিস হিসেবে। গোড়াতেই এ পরিকল্পনায় বিরাট গলদ রয়ে গেছে কারণ এ পরিকল্পনা কাজ করবে যখন ইতিমধ্যেই অনেক কাজ ইউএস থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছে এবং আরও অনেক কাজ যাবার জন্য অপেক্ষা করছে - অর্থাৎ বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই নিজেকে আউটসোর্সিং-এর একটি মার্কেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আমরা জানি বাস্তবে তা এখনও হয়নি।

সুতরাং বিআইবিসির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ফ্যাসিলিটেটিং অফিস হিসেবে কাজ করা নয় বরং মার্কেটিং, সেলস্ এবং বিজিনেস ডেভেলপমেন্ট-এ বিশেষ সহায়তা করা।

২। বাংলাদেশী কোম্পানীগুলো সাধারণত আশা করে যে তারা মোটামুটি সব ধরনের কাজই করতে পারবে যদি কোনভাবে তাদেরকে কাজ জোগাড় করে দেওয়া যায়। এখানে বাস্তবের সাথে অনেক বৈষম্য বিরাজমান। এ ধরনের মানসিকতা ইউএস কোম্পানীগুলোর কাছে প্রকাশ করলে কাজ পাবার সম্ভাবনা আসলে অনেক কমে যাবে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে কি ধরনের কাজ আউটসোর্সিং-এর জন্য রয়েছে এবং তার মধ্যে বাংলাদেশী কোম্পানীগুলো কোন কোন কাজগুলো ভালভাবে করতে পারবে।

৩। দীর্ঘদিন ধরে ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে কাজ পেতে হলে বাংলাদেশের কোম্পানীগুলোকে ভাল core competency তৈরি করতে হবে। এ মুহূর্তে core competency বলতে স্বল্পমূল্যের শ্রম ছাড়া অন্যকিছু আছে বলে মনে হয় না। এটা মোটেই যথেষ্ট নয়। যেসব ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং ভবিষ্যতে বাড়বে সেসব ক্ষেত্রে core competency তৈরি করতে হবে। আর ভাল core competency তৈরি হয়ে গেলে শুধু আউটসোর্সিং নয়, বাংলাদেশের কোম্পানীগুলো আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবে।

৪। বিআইবিসির উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বিআইবিসিকে গড়ে তুলতে হবে একটি আউটসোর্সিং বা অফ-শোর ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী হিসেবে। শুধুমাত্র কো-অর্ডিনেটিং বা ফ্যাসিলিটেটিং অফিস হিসেবে কাজ করলে বিআইবিসি'র উদ্দেশ্যে সফল হবে বলে মনে হয় না যা আগে উলে-খ করা হয়েছে। আর এ জন্য দরকার (ক) একটি ভাল ম্যানেজমেন্ট টিম যার আউটসোর্সিং-এর উপর ভাল অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং (খ) একটি ভাল বিজিনেস প-্যান যাতে বিজিনেস স্ট্র্যাটেজি থেকে শূরু করে সার্ভিস, প্রোডাক্ট, মার্কেটিং, সেলস্, বিজিনেস ডেভেলপমেন্ট, ফাইনানসিয়াল গ্রোথ, রিটার্ন অর ইনভেস্টমেন্ট, প্রয়োজনীয় তহবিল ইত্যাদি সবকিছুরই ভাল বর্ণনা থাকবে। এ ধরনের কোন প-্যান এ মুহূর্তে আছে বলে জানা নেই। এ ব্যাপারে সব বিষয়গুলো ভালভাবে বিশে-ষণ করে বেশ গভীর ভাবে ভাবতে হবে। কারণ বিআইবিসি কাজ করবে অনেকটা আউটসোর্সিং-এর ব্রোকার টাইপ কোম্পানী হিসেবে। আসল কাজ করবে বাংলাদেশী কোম্পানীগুলো। এখানে উলে-খ্য যে, আউটসোর্সিং-এর সাফল্যের জন্য বিআইবিসির উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে বাংলাদেশী কোম্পানীগুলো যেন যতটা সম্ভব নিজেদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

বিআইবিসির কর্মকর্তাগণ এ বিষয়গুলো (বিশেষ করে উপরে বর্ণিত ১ম এবং ২য় বিষয় দু'টো) নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করেছেন এবং কিছু কিছু কার্যকর পদক্ষেপও নিয়েছেন। তবে বিআইবিসির কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে মনে হচ্ছে সে পদক্ষেপগুলো মূলতঃ সেলস্ (এবং কিছুটা মার্কেটিং) ধরনের। বিজিনেস ডেভেলপমেন্ট-এর ব্যাপারটা প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়নি। যে কোন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস-এর জন্য ভাল মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা থাকলে, সেলস্ এর ব্যাপারটা অনেক সোজা হয়ে যায়। তবে যেসব নতুন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস-এর জন্য মার্কেট গড়ে ওঠেনি সে ক্ষেত্রে ভাল কোন সেলস্ করার আগে ভাল বিজিনেস ডেভেলপমেন্ট করা খুবই জরুরী। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে আউটসোর্সিং কোন নতুন সার্ভিস নয়, বাংলাদেশের জন্য এটা নতুন, কারণ বাংলাদেশ এখনও আউটসোর্সিং মার্কেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৩য় বিষয়টি নিয়ে বিআইবিসির সাথে অনেক কথা হয়েছিল এবং বিআইবিসি তা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পুস্তিকায় ছাপিয়েছিল। তবে তারপর আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানা নেই। ভাল core competency ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী কোন আউটসোর্সিং মার্কেট প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

কাজেই বিআইবিসির কাজকর্ম যেভাবে এগুচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে বিআইবিসি এক বছরে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে মোটামুটি সঠিক দিকে এবং কিছুদিনের মধ্যে কিছু কিছু আউটসোর্সিং করতে সম্ভবত সক্ষম হবে। তবে এভাবে এগুতে থাকলে বিআইবিসির উদ্দেশ্য সফল হবে বলে মনে হচ্ছে না। বিআইবিসিকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে করে বাংলাদেশ একটি আউটসোর্সিং মার্কেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রচেষ্টায় উলে-খিত প্রধান ৪টি বাধাকে অতিক্রম করতে হবে। সঠিক স্ট্র্যাটেজি, পরিকল্পনা নিরুপণ এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আউটসোর্সিং মার্কেট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ ব্যাপারে সাহায্য নিতে হবে বিভিন্ন বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, কোর কোম্পিটেন্সি ডেভেলপমেন্ট, এবং নিউ মার্কেট এন্ট্রি জাতীয় কোম্পানি ও সংগঠনগুলো থেকে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাঙালিরা (বিশেষ করে যাদের কোম্পানী রয়েছে এবং যারা আউটসোর্স করতে পারে) এ ব্যাপারে অনেক সহায়তা করতে পারেন। বিআইবিসির উদ্দেশ্য সফলের জন্য বিআইবিসি-কে সাহস নিয়ে পরিস্কারভাবে সরকারকে বলতে হবে কি কি করা প্রয়োজন। অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সঠিকভাবে কি কি করা প্রয়োজন তা সরকারকে বলতে না পারলে সরকারের পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না তা নির্ণয় করা। যেহেতু বিআইবিসি সরকারকে রিপোর্ট করে, বিআইবিসির পক্ষে সরকারের নিয়মের বাইরে কিছু করা খুবই কষ্টকর। তবে এ ক্ষেত্রে এ কষ্টটা বিআইবিসি কে সহ্য করতে হবে। মোদ্দাকথা BIBC needs to lead and manage the boss to really make it successful।

বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় যে বিআইবিসি প্রতিষ্ঠিত করেছে এটা বিরাট পদক্ষেপ এবং অনেক কৃতিত্বের দাবি রাখে। সরকার থেকে এর বেশি আশা করা সম্ভবত আমাদের উচিত নয়। আমাদের উচিত বিআইবিসি'র সাথে কাজ করে একে সফল করে তোলা। এ জন্য দরকার একটি ভাল বিজনেস মডেল যাতে করে ভাল ভাল কোম্পানীগুলোকে আকৃষ্ট করা যায় বিআইবিসি'র সাথে কাজ করতে। আউটসোর্সিং-এর মার্কেট বেশ বড় এবং দ্রুতগতিতে আরও বাড়ছে। এটা আশার কথা। সঠিক কোম্পানীর সাথে পার্টনারশিপ-এর মাধ্যমে এ মার্কেটকে বুঝতে হবে। দেখতে হবে কিভাবে বাংলাদেশী কোম্পানীদের expertise এ মার্কেটে খাপ খাবে, আর খাপ না খেলে দেখতে হবে কিভাবে খাপ খাওয়ানো যাবে এবং দেখতে হবে কি ধরনের core competency তৈরি করলে ভবিষ্যতে মার্কেট শেয়ার ভালভাবে বাড়ানো যাবে, আর এর মাধ্যমেই বাংলাদেশকে একটি অফ-শোর ডেভেলপমেন্ট মার্কেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। ❑

স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া।
জুলাই ১৪, ২০০৪

ডঃ এমদাদ খান সিলিকন ভ্যালীর ইন্টারনেট স্পিচ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মকর্তা।

BIBC-এর এনায়েতুর রহমান ও ফেরদৌস আলমের সাথে আলাপচারিতা

*(পড়শী'র বাংলায় লিখিত প্রশ্নমালার জবাবে বিআইবিসি-এর দু'জন কর্মকর্তা যৌথভাবে ইংরেজীতে লিখিত উত্তর দিয়েছেন। জনাব **এনায়েতুর রহমান** ডিরেক্টর হিসাবে এবং জনাব **ফেরদৌস আলম** সেলস্ কন্সাল্টেন্ট হিসাবে বিআইবিসি-তে কর্মরত। এখানে বিআইবিসি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপ্রাপ্ত অনুবাদ ছাপা হলো। - সম্পাদক)*

এনায়েতুর রহমান

প্রশ্ন : গত এক বছরে BIBC-এর সত্যিকার অর্জন কি?

BIBC : গত এপ্রিলে বিআইবিসি আয়োজিত বিড (bid)-এ ইনফোরেভ লিমিটেড নামে একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান জয়লাভ করে। বিডটি ছিল ১৫০০ ডলারের এবং সেই সাথে ছিল ইনফোরেভ কর্তৃক সফটওয়্যার-এ উন্নয়নকৃত ভবিষ্যৎ বিক্রয়লব্ধ টাকার ৫%। পদক্ষেপ ছোট মনে হলেও যদি সফটওয়্যার ঠিকমত বাজারজাত করা যায় তাহলে আশা করা যাচ্ছে লভ্যাংশের পরিমাণ বড় আকারের হবে। আপনারা যদি কেবলমাত্র ফলাফলের দিকে মনোনিবেশ না করে BIBC-এর প্রচেষ্টাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহলে BIBC কার্যক্রমের কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারি। প্রতিষ্ঠিত হবার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানকে VT100 ইমুলেশন লেনদেনের সুযোগ করে দিয়েছে যারা ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় দ্বিগুণ চেয়েছেন। একইভাবে নির্দিষ্ট আঙ্গিকে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার অভাবে HIPAA data entry অবাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানের কাছে চলে যায়। একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং আর একটি আমেরিকায় বাংলাদেশীদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে যৌথ উদ্যোগে প্রজেক্টের জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, আমেরিকার প্রতিষ্ঠানটি চাচ্ছে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে একটি নির্দিষ্ট প্রায়োগিক (application) প্রোগ্রামিং-এ ট্রেনিং দিতে যে কিনা দেশে ফিরে গিয়ে ডেভলপমেন্ট সেল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। স্বাভাবিকভাবে আমেরিকার প্রতিষ্ঠান চাচ্ছে যে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানটি ঐ ব্যক্তির আসা যাওয়া এবং ট্রেনিং-এর যাবতীয় খরচ বহন করুক। IT প্রতিষ্ঠানটিকে ইনভেস্ট করার আগে ভেবে দেখতে হবে এটা কতখানি লাভজনক হবে। এ ধরনের ব্যবসা সময়সাপেক্ষ এবং উভয় পক্ষকে এ ব্যাপারে ক্রমাগত উদ্যোগ নিতে হবে।

বিআইবিসি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তারা

ইতিমধ্যে BIBC তার সদস্যদের মধ্যে লেনদেনের (sales) ৭টি সুযোগ করে দিয়েছে। Outsourcing প্রতিষ্ঠানটি শুরুতে call center ব্যবসায় আগ্রহী ছিল। ৬টা বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান কল সেন্টার ব্যবসায় তাদের উৎসাহ দেখিয়েছে। BIBC তাদের একজন প্রতিনিধিকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে এই ছয় প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নের জন্য এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করেছে। এখন এটা সম্পূর্ণ এই এজেন্ট প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করছে তারা কাকে মনোনীত করে ব্যবসা চালিয়ে যাবে।

ফেরদৌস আলম

প্রশ্ন : BIBC প্রতিষ্ঠার সময়কার লক্ষ্যমাত্রা কি কি ছিল এবং তার কতটা অর্জিত হয়েছে?

BIBC : BIBC যাত্রার শুরুতে প্রজেক্ট ইমপি-মেন্টেশন প-্যান (PIP) তৈরি করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের সফটওয়্যার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে সহায়তা করা :

(ক) একটি shared office resource center (BIBC) প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসারত দক্ষ আইসিটি প্রতিষ্ঠানগুলো এবং এক্ষেত্রে দক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশীদের (NRB) সাথে যোগাযোগ করা।

সেই হিসেবে এখন পর্যন্ত BIBC ৯৫% লক্ষ্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। শেয়ারড অফিসের ধারণাটি ভাল ছিল। BIBC'র অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ১২টি প্রতিষ্ঠানকে পর্যায়ক্রমে BIBC'র শেয়ারড অফিস ভাড়া দিয়ে তহবিল সংগ্রহ করা এবং তিন বছরের মধ্যে এই ভাড়ার আয় দিয়ে BIBC-কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি নানাবিধ কারণে। তার মধ্যে উলে-খযোগ্য হলো আর্থিক সীমাবদ্ধতা, এগারই সেপ্টেম্বরের পরবর্তী পরিস্থিতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের

বর্তমান নিম্নগামী অর্থনীতি। দক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশী থাকা সত্ত্বেও তারা ভারতীয় আউটসোর্সিং প্রচেষ্টাগুলোর সাথে পাল-া দিয়ে পারেন নি।

PIP-এর মত দলিলপত্র ছাড়াও ওয়ার্ক প-ান এন্ড রোডম্যাপ নামে আরও একটি দলিলপত্র পরবর্তীতে তৈরী করা হয়। চুক্তি মোতাবেক BIBC-এর কার্যক্রম PIP নির্ধারিত মানদন্ডে বিচার করা হবে। রোড ম্যাপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে BIBC-এর সেবাগ্রাহী বাংলাদেশী কোম্পানিগুলো কি কি ধরনের সুবিধা পাবে, রোড ম্যাপে মার্কেটিং ব্রোসিয়্যোর, ওয়েব সাইট, নিউজলেটার এবং একজন চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার নিয়োগের কথা বলা আছে। BIBC তার সাধ্যমত এগুলো সবই করেছে।

BIBC বছরের শেষে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এবং বিশ্বব্যাংককে-এর কার্যকারিতার একটি বিষদ ব্যাখ্যা পেশ করেছে। এই রিপোর্টটিতে খুব সততার সাথে BIBC'র অর্জনগুলো প্রকাশ করা হয়েছে, বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি ডেভিড হলবোর্ন BIBC'র আশাতীত দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছেন। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবে উলে-খযোগ্য লেনদেনের জন্য তিন বছর লাগবে। সে কারণে তারা BIBC-এর জন্য মার্কেটিংকে প্রধান প্রজেক্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো সেলস্‌কে প্রাধান্য দিয়েছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের আইটি প্রতিষ্ঠান এবং উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী মালিকানাভুক্ত আইটি কোম্পানীগুলো কি BIBC-এর সেবা নিতে এখনো উৎসাহী?

BIBC : BIBC তার অধিভুক্ত সদস্যদেরকে সেবাদানে সদা সচেষ্ট। বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো মনে করে যে BIBC তাদের সাহায্যে আসতে পারে। তারা চাচ্ছে BIBC তাদের সেল্-এর দিকে বেশি মনোযোগী হোক। উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব মার্কেটিং ও সেলস রয়েছে। এটোসফ্‌ট BIBC-এর সদস্য এবং তাদের আমেরিকায় শাখা অফিস রয়েছে। তারা ২০০৪ সালের মে মাস পর্যন্ত BIBC-এর অফিস ভাড়া নিয়েছিল। তাদের বিভিন্ন প্রজেক্টের সফলতাই প্রমাণ করে যে আমেরিকায় অফিস থাকলে ব্যবসা পাওয়া যায়। এখানে উলে-খযোগ্য যে এটোসফ্‌ট-এ কয়েকজন তরুণ উদ্যোক্তা রয়েছে এবং BIBC তাদের মত আরও উদ্যোক্তাদের দেখতে চায়।

প্রশ্ন : BIBC গত এক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে কি শিখেছে? এই মুহূর্তে BIBC-এর তিনটি প্রধান সমস্যা উলে-খ করবেন কি?

BIBC : বলা হয় কারও পক্ষে অন্যের অভিজ্ঞতা নকল করা সম্ভব নয়। BIBC তিনভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে :

(ক) বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

(খ) বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং এদের চাহিদা।

(গ) প্রবাসী বাংলাদেশী (NRB), আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারস এন্ড আর্কিটেক্টস (এএবিইএ), BIBC-এর Management of Technical Committee (MTC)-এর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা। এগুলো ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতাগুলো ছিল উলে-খ করার মত ঃ

(ক) *বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ঃ* প্রথমেই BIBCকে শিখতে হয়েছে বাংলাদেশের পদ্ধতি এবং পদক্ষেপগুলো। এ ব্যাপারে BIBCকে ভাগ্যবান বলতে হবে কারণ তারা কিছু দক্ষ সরকারি আমলাদের সাহায্য পেয়েছে যারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন BIBCকে দ্রুত এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে।

(খ) *বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান এবং তাদের চাহিদা বিষয়ক অভিজ্ঞতা ঃ* এটা ছিল কঠিনতম কাজ। BIBC কিভাবে এগোবে এই নিয়ে এর ৩২ জন সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান তাদের অধিকার বলে চাপ দিয়েছে তাদের মত করে BIBCকে চালাতে। এদের মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা যথেষ্ট করিৎকর্মা ছিল যাদের মতামত বিবেচনা করে BIBCকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যাতে করে সব পক্ষই লাভবান হয়।

(গ) *প্রবাসী বাংলাদেশী, AABEA এবং MTC-এর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ঃ* প্রবাসী বাংলাদেশীদের কিছু অংশ গত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশে আইটি উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে যোগাযোগ রাখেনি। কাজেই BIBCকে উদ্যোগী হতে হয়েছে open house & product showcase-এর মত অনুষ্ঠানের। উদ্দেশ্য ছিল দক্ষ ব্যক্তি ও কোম্পানীদের চিহ্নিত করা। BIBC খুব সফলতার সাথে AABEA-এর সাথে কাজ করতে শিখেছে। এই সুবাদে গঠনমূলক, বিশ্বাসযোগ্য ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

MTC সদস্যদের অনেকেই অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য। এই স্বেচ্ছাসেবীরা সবাই কর্মক্ষম ও ভাল কিন্তু এখানে নতুন মুখ আনা উচিত।

ভবিষ্যতের জন্য তিনটি প্রধান সমস্যা হলো ঃ

(ক) BIBC সদস্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য ব্যবস্থা ও সহায়তা করা।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসারত দক্ষ ICT প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে প্রবাসী দক্ষ বাংলাদেশীদের সাথে যোগাযোগ করা।

(গ) BIBC-এর প্রতি উৎসাহী বিভিন্ন গ্রুপের বিভিন্ন ধরনের আশাবাদের ব্যবস্থাপনা।

প্রশ্ন : BIBC-এর গঠন কাঠামো অনুযায়ী BIBC-এর জবাবদিহিতা কার কাছে এবং কতটা স্বচ্ছ?

BIBC : BIBCকে ICT'র Business Promotion Council (IBPC)কে জবাবদিহি করতে হয় এবং সেটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে। IBPC'র আবার বিভিন্ন সেক্টর আছে যেমন আইসিটি, চামড়া, হালকা প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন ডেপুটি সেক্রেটারি এই কাউন্সিলের ব্যবস্থাপক যিনি আরও কয়েকজন ভাইস চেয়ারম্যানের সহযোগীতায় কাজ করেন। ভাইস চেয়ারম্যানের পদগুলো পূরণ করা হয় কয়েকটি পেশাজীবী সংগঠনের সভাপতিদের নিয়ে - আই.এস.পি এসোসিয়েশন, BASIS এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ইত্যাদি। BIBC-এর বাজেটে বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ দেয়া আছে। উদাহরণস্বরূপ BIBC-এর পরিচালক যদি call center conference-এ যোগ দিতে আটলান্টা যেতে চান, IBPC-এর অনুমোদন নিয়ে তবে নির্দিষ্ট খাত থেকে খরচ করা যেতে পারে। BIBC সব ধরনের খরচের রেকর্ড রক্ষা করে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজেক্ট ডিরেক্টরের কাছে পাঠায়। BIBC মনে করে যে এ ধরনের স্বচ্ছতা প্রয়োজনের চাইতেও বেশি।

প্রশ্ন : BIBC-এর বাৎসরিক বাজেট কত? বাজেটের উৎসগুলো কারা?

BIBC : BIBC-এর কাজ শুরু হয় ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ৪৯৯ হাজার মার্কিন ডলারের একটি বাজেট অনুমোদিত হয় ২০০৪ সালের জুন পর্যন্ত। চলতি সালের জন্য একটি বাজেট বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের (IBPC)-এর কাছে জমা দেয়া হয়েছে। জুলাই ১৫-এর খবর অনুযায়ী একটি পরিবর্তিত বাজেট অনুমোদিত হয়েছে বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে। বিস্তারিত লাইন আইটেমসহ বাজেট এখনো হাতে পৌঁছেনি। গত বছরের বাজেট এসেছে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। এ বছরের জন্য BIBC'র যাবতীয় অর্থ সংস্থান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছ

থেকে আসবে। বিশ্বব্যাংককে আবারো অংশগ্রহণ করানোর প্রস্তাব বিবেচনায় রয়েছে।

প্রশ্ন : প্রবাসী উৎসাহী বাংলাদেশীদের BIBCতে অংশগ্রহণের সুযোগ কোথায় ও কতটা?

BIBC : সিলিকন ভ্যালির প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটি BIBCকে সরাসরি সাহায্য করতে পারে বিভিন্ন কর্মকান্ডে সংশি-ষ্ট হয়ে :

– BIBC আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে,

– BIBC কে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে,

– বাংলাদেশী আইটি কোম্পানীগুলোর কার্যক্রম তুলে ধরে যৌথ কারিগরী সেমিনারের ব্যবস্থা করে অন্যান্য প্রবাসী বাংলাদেশীরাও অংশগ্রহণ করতে পারে।

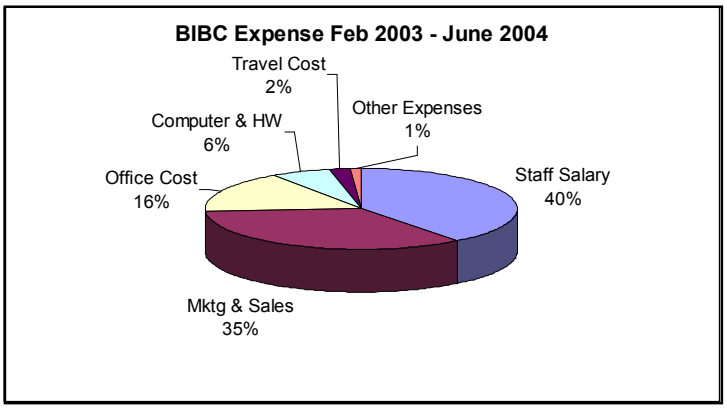

BIBC website (www.bibc.biz)-এ গমন করে এবং বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে একে আরও উন্নত করতে পারে। Web site link-এর মাধ্যমে BIBC সংবাদ পরিক্রমা পাঠ করে। বাংলাদেশী কোম্পানীর জন্য আপনি এবং আপনার কোম্পানী কিভাবে ব্যবসা আনয়নে সাহায্য করতে পারেন তা BIBCকে জানান। প্রশিক্ষণে আপনার যদি কোন প্রতিভা থাকে তাহলে BIBC'র সাথে যোগাযোগ করুন এবং দেখুন কিভাবে আপনার প্রতিভা BIBC'র সদস্য কোম্পানীগুলোর নৈপূন্য বাড়ানোর কাজে সহায়ক হয়। ❑

সান্টা ক্লারা, ক্যালিফোর্নিয়া।

২৭ জুলাই, ২০০৪

আলাপচারিতা ও অনুলিখন : **সাবির মজুমদার**।

আইরিন খান

শামীম আজাদ

দু' হাজার এক সালের আগষ্ট মাসে পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে আইরিন খান যোগ দেন। এই সংস্থায় তিনি শুধু প্রথম মহিলা নন, তিনি প্রথম এশিয়ান ও প্রথম মুসলিমও বটে। এরকম একটি সংস্থার কর্ণধার হিসেবে যোগ দিয়েই বাংলাদেশী আইরিন এই সংস্থায় এক নতুন দিক নির্দেশনা নিয়ে আসেন। এই সংস্থার মূল নীতিতে মানুষের কল্যাণকে তিনি কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন।

তিনি যখন যোগ দেন তখন সংস্থার চলি-শতম বার্ষিকী। আর তখন সংস্থাটি ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার আলোকে বিশ্বের জটিল মানবাধিকার ভঙ্গ মোকাবেলার জন্য এর প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ও নবায়ন শুরু করেছিলেন।

যোগ দেয়ার প্রথম বছরেই তিনি সংস্থার সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি মোকোবেলার প্রক্রিয়া সংশোধন করেন। তার নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল আফগানিস্তানে বোমা হামলার সময় পাকিস্তানে, ইজরায়েল কর্তৃক জেনিন দখল করার সময়ে ইজরায়েলে ও অধিকৃত প্যালেস্টাইনে এবং মে ২০০২ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের সময় কম্বোডিয়ায় যান।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোশাররফ, লেবাননের প্রেসিডেন্ট লাহুদ এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে এই সব দেশে নারীদের মানবাধিকার রক্ষার্থে মিটিং করেন। নারী মানবাধিকার রক্ষার্থে তিনি এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালে বিশ্বজুড়ে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাবিশ্বের নারী মানবাধিকার কর্মীদের সাথে এক আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

আইরিন খান

তিনি মানবাধিকার লংঘনের গোপন ঘটনাগুলোর প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট হন। অস্ট্রেলিয়াতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের বন্দীদশার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে সফল হন। বুরুন্ডির সংঘর্ষে প্রেসিডেন্ট বুজইয়া ও সংশি-ষ্ট অন্যান্য দলের সঙ্গে দেখা করে গণহত্যার ও মানবাধিকার লংঘন না করার আহব্বান জানান। বুলগেরিয়াতে তিনি মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিরোধের আহ্বান জানান।

মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে আগ্রহী আইরিন ১৯৭৭ সালে 'কনসার্ন ইউনিভারসাল' নামে একটি উন্নয়নমূলক সংস্থা গঠণ করেন এবং ১৯৭৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস্'-এর সঙ্গে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন।

১৯৮০ সালে তিনি 'ইউএনএইচসিআর'-এ যোগদান করেন এবং এর হেড কোয়ার্টার ও অন্যান্য মাঠ পর্যায়ে উদ্বাস্তু রক্ষার্থে কাজ

করেন। ১৯৯১-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি তৎকালিন 'ইউএনএইচসিআর'-এর কমিশনার মিসেস সাদাকো ওগাতার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৫ সালে তিনি একই সংগঠনের চিফ অব মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসময় তিনি প্রতিষ্ঠানের সর্বকনিষ্ঠ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ছিলেন। ১৯৯৮ সালে একই সংস্থার গবেষণা ও দলিল রচনা বিভাগের প্রধান হন। ১৯৯৯ সালে কসোভো ক্রাইসিসের সময় যুগোস্লাভিয়া রিপাবলিকের মেসেডোনিয়ায় তিনি 'উইএনএইচসিআর' দলের নেতৃত্ব দেন। এবং সে বছরের শেষেই ইন্টারন্যাশনাল প্রোটেকশনের ডেপুটি ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

আইরিন ব্রিটেনের ম্যানচেস্টার ইউনিভারসিটিতে ও আমেরিকার হার্ভার্ড ল' স্কুলে পাবলিক ইন্টারন্যাশনাল ল' এবং হিউম্যান রাইট্স-এ বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন। ২০০২ সালে পিলকিংটন 'উইম্যান অব দা ইয়ার' এওয়ার্ড সহ অনেক পদক ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ লাভ করেছেন। ❑

লন্ডন, যুক্তরাজ্য।

২৭ জুলাই, ২০০৪

শামীম আজাদ কবি, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী।

এক নজরে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক মানবাধিকার পরিস্থিতি

মিনহাজ আহমদ

ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব সৈয়দ হাসান আহমদ গত ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের সাথে এক পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন। এ বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিলো যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সচেতন করে তোলা। মাননীয় রাষ্ট্রদূত মহাশয় বোধ হয় ধরে নিয়েছেন যে, প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকরা তাদের কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। সম্ভবতঃ দায়িত্ববোধের তাড়নায় সে হারানো কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে দেয়ার ব্রত নিয়ে ওয়াশিংটন থেকে ছুটে এসেছিলেন রাষ্ট্রদূত মহোদয়।

আসলে রাষ্ট্রদূতের এ ছুটাছুটিতে এখানে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয়েছে। সরকার চায় সাংবাদিকদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে। প্রবাসী সাংবাদিকদের তো আর গুণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে কিংবা মৃত্যু পরোয়ানা জারী করে শায়েস্তা করা যাবে না, তাই এদের জন্য চাই একটা বিকল্প ভদ্র ব্যবস্থা। এরকম বৈঠক করেই হোক আর যেভাবেই হোক, প্রবাসের সাংবাদিকদের কলমকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারলে সরকারের মানবাধিকার দলনকারী বিভিন্ন কার্যকলাপের খবর প্রচার বিদেশে বন্ধ করা যাবে বলে সরকারের ধারণা।

বাংলাদেশে সাংবাদিক আর মুক্তমনা মানুষের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার এমন প্রচেষ্টা যে শুধু বর্তমান সরকারের আমলেই দেখা যাচ্ছে, তা নয়, বরং বলা যায়, বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডের সকল গণতান্ত্রিক-অগণতান্ত্রিক সরকারের আমলেই এমন দেখা গেছে। অতীতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের চেয়ে খুব একটা যে কম ছিলো, সেটা বলা যাবে না। তবে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার যেহেতু বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে নিরন্তর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে, সেহেতু বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে কোন আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে বর্তমান সরকার প্রসঙ্গ সামনে চলে আসে।

জাতীয়ভাবে একটা দেশের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের প্রধান রক্ষাকবচ হলো দেশের শাসনতন্ত্র। সে বিবেচনায় ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সংবিধান মোটামুটিভাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের অধিকাংশই নিশ্চিত করতো। উক্ত শাসনতন্ত্রটিতে মানুষের বাক, ব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম প্রচার, স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হওয়ার ও স্বাধীন ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং লিঙ্গভিত্তিক সমানাধিকার, প্রশাসনকে সরকারের নিয়ন্ত্রমুক্ত রাখা, সরকারের বিচার বিভাগের ও সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও টিভির স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা, সরকারের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রনমুক্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রচার ও গণমাধ্যমের উপস্থিতি - ইত্যাদির অধিকাংশই স্বীকৃত ছিলো। কিন্তু ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু করে একাধিক শাসনতন্ত্র সংশোধনী মানবাধিকার বাস্তবায়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ উপরোক্ত বিষয়সমূহকে অবহেলা করতে সরকারসমূহকে আনইনানুগ ক্ষমতা দিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারের আমলেই প্রশাসনের এবং বিচার বিভাগের উপর সরকারের শাসনতন্ত্রসম্মত আধিপত্য ব্যবহার করে সরকারকে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হতে দেখা গেছে।

দেশের সম্মানিত নাগরিকদের রাজনৈতিক শত্রুতার কারণে সন্দেহভাজন দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করে মামলা দায়ের করে জেলে দেয়া এবং তাদের জামিন মঞ্জুর না করা, অপরদিকে বিপজ্জনক সন্ত্রাসী ও খুনের মামলাসহ বহু মামলার আসামীর জামিন মঞ্জুর করা কিংবা গ্রেফতার না করা এবং সরকারদলীয় নেতা এবং মন্ত্রীদের সঙ্গী হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় তাদের প্রকাশ্য দৃশ্যমান হওয়া, সরকারী হেফাজতে বিচারাধীন আসামীর মৃত্যু, রিম্যান্ডের বা জিজ্ঞাসাবাদের নামে গ্রেফতারকৃত সন্দেহভাজন আসামীদের উপর অমানুষিক শারিরীক নির্যাতন করা, উগ্র ইসলামী মৌলবাদী কর্তৃক বিভিন্ন ফতোয়ার মাধ্যমে নারী অধিকার হরণ করা - এগুলো বাংলাদেশের সরকারগুলোর দ্বারা সংগঠিত মানবাধিকার হরণের সাধারণ ঘটনা।

বর্তমান সরকারের আমলে সকল প্রকার মানবাধিকার হরণকারী ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে উদ্বেগজনকভাবে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মানবাধিকার কর্মী ও এনজিও কর্মীদের উপর নির্যাতন। এ ছাড়াও এবারের সরকারের মানবাধিকার বিরোধী কর্মতৎপরতার সাথে নতুন মাত্রা যোগ করেছে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং লেখক-লেখিকাদের উপর এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর ব্যাপক নির্যাতন-নিপীড়ন। পুলিশ কাস্টোডিতে বিচারাধীন আসামী খুন করা, সংসদে তাদের জন্য ইনডেমনিটি বিল পাশ করা, আহমদীয়াদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা, সংবিধানের মানবাধিকার সংক্রান্ত ধারা রহিত করে বিভিন্ন কালাকানুন জারী করা। এগুলোর কারণে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে। বিচারাধীন আসামীর উপর নির্যাতন, জেলগুলোর অমানবিক পরিবেশ, মামলায় দীর্ঘসূত্রীতা ইত্যাদিও মানবাধিকার বাস্তবায়নের পথে বড়

অন্তরায়। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিরবতার বড় কারণ হচ্ছে পুলিশ বাহিনীর পক্ষপাতিত্ব। যে কোন ফ্যাসীবাদী সরকারের ন্যায় বর্তমান বাংলাদেশ সরকার সরকারবিরোধী প্রচারণাকে দমন করার জন্য সরকারবিরোধীতা ও রাষ্ট্রবিরোধীতাকে সমার্থক আখ্যায়িত করেছে।

২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে এবারই সর্বপ্রথম ধর্মীয় উগ্র মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোট বিনএপি'র সাথে ঐক্যজোট গঠন করে ক্ষমতায় গিয়েছে। উক্ত নির্বাচনে ঐক্যজোটভূক্ত দলগুলো সারা দেশে বিজিত রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও অমুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করেছে। উলে-খযোগ্য সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নৃশংসভাবে হত্যা, ধর্ষণ ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত করেছে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মানবাধিকারবাদী ও গণতন্ত্রকামী মানুষেরা দৃষ্টিপাত নামক সংগঠনের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে বরিশালের অন্নদা প্রসাদ গ্রামের কিছুসংখ্যক হিন্দু নাগরিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। বাংলাদেশের সকল মানবাধিকারবাদী সংগঠন, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকরাও এ নিয়ে দেশের অভ্যন্তরেও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

এ ছাড়াও অতি সম্প্রতি 'বাংলা ভাই'সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উগ্র ইসলামী জঙ্গী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দমন না করে, উল্টো তাদের প্রশ্রয় দিয়েও সরকার পরোক্ষভাবে জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণের পথে বাধা তৈরী করছে।

দেশের অভ্যন্তরে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও দমন নিপীড়ন বন্ধ না করে জবরদস্তিমূলকভাবে কি প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যাবে, বিশেষতঃ ফ্রী স্পীচ-এর দেশ আমেরিকায়? এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত বাংলাদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনসমূহের প্রকাশিত প্রতিবেদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা যেমন: এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ব্যুরো অব ডেমোক্র্যাসী, হিউম্যান রাইটস্ এন্ড লেবার, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রসমূহের প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে বলা যায়, বাংলাদেশে সরকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার বেপরোয়াভাবে লঙ্ঘন করে চলেছেন। ❑

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক।

২৬ জুলাই, ২০০৪

বিশ্ব মানবাধিকার এবং এক আইরিন খানের আহবান

আবু আহমেদ

আইরিন জেড খান বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর সেক্রেটারি জেনারেল। কোনো বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত নারীর এটাই সর্বোচ্চ পদে আরোহন, অন্তত সম্মানে এবং প্রচারে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বা সংক্ষেপে অ্যামনেস্টি একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এনজিও এবং বিশ্বে মানবাধিকারকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর অনেক সুখ্যাতি আছে। এক সময় তৃতীয় বিশ্বের অনেক লেখক অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বক্তব্যকে একপেশে মনে করতো। তারা ভাবতো ঐ সংস্থা শুধু বিশ্বের ধনী দেশগুলোর সংজ্ঞায়িত মানবাধিকারের পক্ষে লড়ছে, দরিদ্র দেশগুলোতে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সে ব্যাপারে ঐ সংস্থার মাথাব্যথা নেই। মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ লোক মনে করতো এই সংস্থাও পশ্চিমের গণমাধ্যমের মতো মুসলমান বিরোধী। বিরোধী না হলে অধিকৃত এলাকায় ইসরাইল কর্তৃক যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে সে ব্যাপারে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সোচ্চার নয় কেন? আসলে পশ্চিম তীরের ইহুদি কর্তৃক প্যালেস্টাইনিদের ওপর নির্যাতনের ক্ষেত্রে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আগেও প্রতিবাদ করেছিল, তবে প্রতিবাদটা মিস আইরিনের সেক্রেটারি জেনারেল হওয়ার পর জোরালো হয়েছে। আগে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতো সরকার কর্তৃক বিরোধীদের নির্যাতনের মাধ্যমে, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের মাধ্যমে, সমাজের দুর্বল অংশের ওপর সবল অংশের জোর করে শাসন চালানোর মাধ্যমে। যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এক রাষ্ট্র কর্তৃক আরেক রাষ্ট্র আগ্রাসনের মাধ্যমে, বিশেষ করে এক সময়ের মানবাধিকারের অভিভাবক বর্তমানে আগ্রাসী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক।

মিস আইরিন খান সেদিন (গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০৩) ঢাকাতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক আয়োজিত সিভিল সোসাইটির এক সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে একমাত্র সুপার পাওয়ার কর্তৃক অন্যের দেশ দখল, সংবাদপত্রের ভূমিকা এবং এনজিওগুলোর দায়বদ্ধতাসহ অনেক বিষয়ে অতি খোলামেলাভাবে অনেক বক্তব্য দিয়েছেন। ঐ সমাবেশে সাবেক মন্ত্রী, সাবেক রাষ্ট্রদূত, সচিব, অর্থনীতিবিদ, গণমাধ্যমের ব্যক্তিত্বসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

আইরিন খান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরাক দখল করে গেরিলা হামলার মোকাবিলার নামে এমন কৌশল অবলম্বন করেছে, যা অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরাইলিরা যে নিপীড়ন চালাচ্ছে তার অনুরূপ। যুক্তরাষ্ট্র যে এখন নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাস দমনের নামে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে তা তিনি প্রকাশ্যেই তুলে ধরলেন। যুক্তরাষ্ট্র নিজের দেশে বৈষম্যমূলক আইন তৈরি করে বিশেষ ধর্মের এবং বর্ণের লোকদের বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল যাবত জেলে রাখতো। তারা কিউবার গুয়ান্তানামোতে আটক রেখেছে অনেক শিশুসহ নিরপরাধ লোকদের যাদের শুধু অর্থের বিনিময়ে আফগান ওয়ার লর্ডরা মার্কিন বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার দু' মানদন্ডে চলে। যাদের তারা কল্পিত হুমকি মনে করে তাদের তারা খুশিমতো গ্রেপ্তার করছে। যুক্তরাষ্ট্রের এসব কর্মকান্ড দেখে যেসব সমাজ এবং রাষ্ট্র আগে মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে ইতস্তত করতো এখন ঐসব সমাজ ও রাষ্ট্র অতিসহজেই বিচিত্র ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে।

ব্রিটেনেও সে একই ধাঁচের আইন তৈরি করা হয়েছে। সন্ত্রাসের কোনো ব্রিটিশ নাগরিকের সহযোগী ছিল শুধু এই সন্দেহে অনেক বিদেশীকে জেলে নেওয়া হয়েছে। অথচ ব্রিটিশ নাগরিকটি ঠিকই জেলের বাইরে আছে। কারণ ব্রিটিশ নাগরিক হলে তাকে বিনা বিচারে জেলে রাখার

বিধান নেই। এসব বৈষম্যমূলক আইন এবং আইনের প্রয়োগকে ৯/১১-এর পর সন্ত্রাস দমনের নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বর এর ঘটনা যেন যুক্তরাষ্ট্রকে সব অন্যায় কাজের বৈধতা দিয়ে দিয়েছে। আইরিন খান আরো বলেছেন, বিশ্বে বেশি লোক মারা যাচ্ছে ক্ষুদ্র অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার থেকে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুদ্র অস্ত্রের উৎপাদন ও রপ্তানির পক্ষে অবস্থান নিতে চাচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্ট স্থাপনেরও বিরোধী, পাছে তাদের সৈন্যরা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠনের দায়ে অভিযুক্ত হয়। আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্যরা বোমা ফেলে অনেক শিশুকে হত্যা করেছে, অথচ এ ব্যাপারে একটা নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠান করতে দিতে যুক্তরাষ্ট্র রাজি নয়। যুক্তরাষ্ট্র ইরাকেও গেরিলা ধরার নামে সবাইকে শাস্তি দানের কৌশল গ্রহণ করেছে, যে নীতি কোনো আন্তঃআইন ও কনভেনশন অনুমোদন করে না।

আইরিন খানকে প্রশ্ন করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র তো আজো বিশ্বের অমুক অমুক ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে লেকচার দিয়ে থাকে। তাদের লেকচার কিভাবে গ্রহণ করা উচিত? উত্তরে আইরিন খান বলেন, মানবাধিকার সর্বজনীন, একে কোনো রাষ্ট্রের বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত নয়। আমি কোনো দেশের আচরণকে পছন্দ না করতে পারি, কিন্তু সত্যি যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে সে ব্যাপারে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আইরিন খান আরো বলেন, আপনি আপনার সমাজে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। দেখবেন অনুরূপ ঘটনা বিশ্বের অন্যত্রও কমে গেছে। আপনি আপনার সমাজে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এ জন্যই দাঁড়াবেন যে, তাতে করে আপনি যেথায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে দেখবেন সে ব্যাপারেও প্রতিবাদ করতে পারবেন। বাংলাদেশে বরিশালের হিন্দু মেয়ে নারীর ধর্ষণের কথা উলে-খ করে বলেন, ধর্ষিত কি হিন্দু মেয়ে হয়েছে না মুসলমান মেয়ে হয়েছে এটা বড় কথা নয়। আপনাদের রুখে দাঁড়াতে হবে ধর্ষণের বিরুদ্ধে। এ জন্যই যে, ঐ ঘটনা যাতে পুনরায় কোন মুসলিম নারীর বিরুদ্ধে না ঘটে। যারা ধর্ষণ করছে তারা শুধু হিন্দু বেছে বেছে ধর্ষণ করবে না। ঐ কাজটি তারা করে যেতে থাকবে যদি ঐ নিন্দিত কাজের শাস্তি না হয়। আইরিন খান এও বলেন, নিরাপত্তার কথা বলে ভারতও এমন আইন বানিয়েছে, যা বৈষম্যমূলক এবং মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থি।

তিনি আরও বলেন, আজকে বিশ্বে কি ঘটছে? এসব তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় সত্য, তবে পূর্বের তুলনায় গণমাধ্যম স্বাধীন হয়েছে এটা বলা যাবে না। বরং গণমাধ্যমের মালিকানা ঐসব করপোরেশন বা কোম্পানির হাতে চলে যাচ্ছে। আইরিন খান এনজিওগুলোর অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, অবশ্যই এনজিওগুলোকে তাদের অর্থের উৎস, ব্যয়ের ধরণ ইত্যাদি ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তিনি এও বলেছেন, আজকে বিশ্বব্যাপী এতোটা সিভিল সোসাইটির উদ্ভব হচ্ছে, যারা নিরাপত্তার নামে অন্যের দেশ দখলের বিরোধীতা করছে, যারা উচ্চকণ্ঠে বলছে, যারা অতি ক্ষমতাধর তারাই বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী। এই সিভিল সমাজের আত্মপ্রকাশ ঘটছে সব ধর্মের মানুষদের নিয়ে। তাদের ভাষা ও প্রতিবাদ সামনে আরো জোরালো হবে। আইরিন খান বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের মনের কথা দেশে দেশে বলে বেড়াচ্ছেন। আমরা তার সাফল্য কামনা করি। ❑

ঢাকা থেকে।

৩১ জুলাই, ২০০৪

আবু আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনারত।

এক নজরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ইতিহাস

কোথায় শুরু?

১৯৬১ সালের মে মাসের ২৮ তারিখ ইংল্যান্ডের অবজারভার পত্রিকায় আইনজীবি পিটার বেনেনসন একটি প্রবন্ধ ছাপান। প্রবন্ধটির বিষয় ছিলো পর্তুগালের দুই ছাত্রের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে ওয়াইন টোষ্ট করার অপরাধে কারাবরণের বিরুদ্ধে অ্যামনেস্টি '৬১ নামে একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন শুরু করা। সেই ছিলো অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বীজ।

কারা প্রথম সারিতে ছিলেন?

বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬১-এর জুলাই মাসে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে সাংগঠনিক রূপ দেন।

প্রথম অফিস কোথায় ছিলো?

মাইটার কোর্ট, লন্ডন, যুক্তরাজ্য।

প্রথম অ্যামনেস্টি মোমবাতি কোথায় জ্বালান হয়?

প্রথম অ্যামনেস্টি মোমবাতি জ্বালান হয় সেইন্ট-মার্টিনস-ইন-দি-ফিল্ডস গীর্জায় আন্তর্জাতিক মানবতা দিবস ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬১ সালে।

প্রথম বছরের খরচ কত ছিলো?

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রথম বছরের খরচ ছিলো ৬,০৪০ যুক্তরাজ্য পাউন্ড।

প্রথম ইন্টারন্যাশনাল একজিকিউটিভ কমিটি কখন গঠিত হয়?

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রথম ইন্টারন্যাশনাল একজিকিউটিভ কমিটি গঠিত হয় ১৯৬৩ সালে। আয়ারল্যান্ডের সন ম্যাকব্রাইড ছিলেন এর প্রথম চেয়ারম্যান।

কখন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়?

সন ম্যাকব্রাইড ১৯৭৪ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষে প্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

বন্দী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কখন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রথম সোচ্চার হয়?

বন্দী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রথম থেকেই সোচ্চার ছিলো। ১৯৭২ সালে প্রথমবারের মতো পৃথিবীব্যাপী বন্দী নির্যাতন বেআইনী ঘোষণা করার জন্য আন্দোলন শুরু করে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ জেনারেল এসেমবলী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রস্তাবনা গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ বন্দী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঘোষণা দেয়। ❑

ফুয়াদ রাহমান
স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া